মুজিব হত্যার নীলনক্সাঃ আমি যতটুকু জানি

আহমেদ ছফা

উনিশ শ পঁচাত্তর সালের চৌদ্দই আগস্টের রাতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি শোকাবহ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের অনুপুঙ্খ বিবরণ এখনো লিখিত হয়নি। দেশি- বিদেশি অনেক লেখক- সাংবাদিক বিষয়টি নিয়ে একাধিক পুস্তক রচনা করেছেন। তারপরেও একথা নিশ্চিত সত্য যে, আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে আমাদের জনগণের কৌতুহল চরিতার্থ করার উপযোগী করে হত্যাকান্ড নাটকের একটি বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ অদ্যাবধি রচিত হয়নি। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে গবেষকদের দৃষ্টি শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের মত অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হবে। অনেকগুলো কারণেই এই বিষয়টি গুরুত্বসম্পন্ন।

প্রথমত, এই হত্যাকান্ডের ফলে জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মানো বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটল, গবেষকরা তীক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে মুক্তিযুদ্ধের আপাত বিজয় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় কিভাবে পর্যবসিত হল, সে কাহিনী বেরিয়ে আসবে। দ্বিতীয়ত, একটি দেশের ভেতরের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অন্দরমহলে বিশ্বাসঘাতকতার শক্তি কিভাবে ঘাপটি মেরে আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময়টির প্রতীক্ষা করতে থাকে তারও একটি চিত্র পাওয়া যাবে। তৃতীয়ত, মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া একটি দেশের অহংপুষ্ট শাষকগোষ্ঠী বুলিসর্বস্ব জাতীয়তাবাদের স্লোগান আউড়ে জনগণের মধ্যে মোহের মায়াজাল সৃষ্টি করে না শুধু, শাষকগোষ্ঠী নিজেরাও নিজেদের উচ্চারিত মিথ্যা বুলির শিকারে পরিণত হয় ; জনগণকে রক্ষা করা দূরে থাকুক শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের থাকে না, গবেষকরা মুজিব হত্যা এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তার একটি প্রকৃত দৃষ্টান্ত পেয়ে যাবেন। চতুর্থত, তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন ত্রুটি, কোন গলদ এবং কোন ফাঁক ফোকড়ের ভেতর দিয়ে সামরিক বাহিনী শাসনকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তার সঙ্গত যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো উদ্ভাবন করতে পারবেন।

সাম্প্রতিক সময়ে গবেষকরা নানা উৎস ঘেঁটে যে সকল প্রমাণপঞ্জি সংগ্রহ করেছেন, তার ভিত্তিতেই অবলীলায় বলে দেয়া যায়, মুজিব হত্যা ক্ষণিকের স্বতঃ স্ফূর্ততায় মধ্যরাতে ঘটে যাওয়া নিছক বিয়োগান্তক ঘটনা নয় ; বরং বলা যেতে পারে এটা এমন একটা ঘটনা যা অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং কুশলী পরিকল্পনাবিদেরা একটা দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরম্পরা প্রণয়ণ করে ঘটিয়ে তুলেছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমি যেসব কথা বলব, যে সকল ঘটনার বর্ণণা করব এবং যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করব, সে সকল ব্যক্তি এবং ঘটনার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ রয়েছে। যেহেতু নিজের মুখে আমি বিষয়টি বিবৃত করছি, তাই আমার নিজের প্রসঙ্গেও কিছু কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। নিজেকে উহ্য রেখে কাহিনীটা প্রকাশ করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু সেটা অসম্ভব। বর্ণিতব্য বিষয় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলবে। নিজের জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসারে একটুকুও অতিরঞ্জিত না করে যা শুনেছি এবং দেখেছি, বর্তমান রচনাটিতে সেসব কথা বলে যাচ্ছি।

প্রথমে নিজের কথা বলি। উনিশ শ একাত্তর সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার বহু পূর্ব থেকে, একজন লেখক কর্মী হিসেবে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহন করি। পঁচিশে মার্চে সেনাবাহিনীর উলঙ্গ আক্রমণের পর অন্যান্যদের মত আমিও ভারতে যাই । আমি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না। তাছাড়া আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের অনুগামী দুটিদলের লোকজন আমাকে বামপন্থী হঠকারী মনে করত এবং আমার প্রতি সন্দেহ পোষণ করত। সেজন্য ইচ্ছা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। লেখালেখির মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের কাজ করেছি ।

কোলকাতা থেকে স্বাধীন দেশে ফেরার পর শাসকদল আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ দেখে আমার অন্তর বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। লিখিতভাবে আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ করতে থাকি। সে সময়ে আমি ছিলাম বাংলা একাডেমীর গবেষক। “গণকন্ঠ” পত্রিকাটি সবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ওই কাগজে নিয়মিত কলাম লেখার কারণে সরকারি দৃষ্টিতে বিস্তর সুখ্যাতি অর্জন করি। এক সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় আমাকে একাডেমীর কাজটি ছেড়ে দিতে হয়। সেই সময়ে বর্তমান জাত্তীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান। আমি তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলাম। তিনি আমাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধীনে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেন। তখন “জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল” গঠিত হয়েছে। তাদের মুখপত্র “গণকন্ঠে”র লেখক হিসেবে ঐ দলটির খুচরোখাচরা নানাবিধ কাজকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি। জাসদের মুখপত্রে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে লিখেছি, জাসদের, ছাত্রলীগের,

শ্রমিক- লীগের প্ল্যাটফর্ম থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছি। তখনকার আওয়ামী লীগের ভদ্র শান্ত চেহারা ছিল না। কেউ টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করলেই টুঁটি চেপে ধরতে ছুটে আসত। থাপি আমরা সাহস করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, লিখেছি এবং সভা সমিতির আয়োজন করেছি। সেসব কথা থাকুক। আবার নিজের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। চুড়ান্ত খারাপ অবস্থায় আমার দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছিল। পঁচাত্তরের মাঝামাঝি সময়ে আমি গবেষণা কর্মটি চিঠি লিখে ছেড়ে দেই। এক ধরনের অভিমান থেকে তা করি।

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষিকা মিসেস হুসনে আরা হক আমাকে স্নেহ করতেন। এক সময়ে আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। তাঁর স্বামী জনাব আজিজুল হক ছিলেন পাকিস্তান আমলে "কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী"র ডিরেক্টর। পরে জিয়াউর রহমানের আমলে তিনি কৃষিমন্ত্রী হয়েছিলেন। তারও পরে তিনি আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা "সিরডাপের" প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। সেই সময়ে সেই পরিস্থিতিতে দুবেলা অন্নসংস্থান করাও আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমার দুর্দশা দেখে জনাব আজিজুল হক দয়া পরবশ হয়ে "ইউনিসেফ" থেকে আমার জন্য একটি গবেষনা প্রকল্প সংগ্রহ করেন। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ঐ সময়ে জনাব হক ছিলেন ইউনিসেফের বাংলাদেশ শাখার প্রধান উপদেষ্টা। গ্যাসকার্ট নামে ইউনিসেফের একজন জার্মান তরুণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। গ্যাসকার্ট ছিলেন জার্মান সাহিত্যের অনুরাগী এবং ভাল বেহালাও বাজাতেন। গ্যাসকার্ট একজন আইরিশ মহিলার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। খুব সম্ভবত আমার মত অনভিজ্ঞ একজন লোকের একটি গবেষণা প্রকল্পের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যাপারে তিনিও কিছু ভূমিকা পালন করে থাকবেন। আমি একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করব এটা তো নিশ্চিত হল। কিন্তু গোল বাধল একতা ব্যাপারে। উন্নয়নের ব্যাপারে আমার সামান্যতম অভিজ্ঞতাও নেই। তাই আজিজুল হক সাহেব আমার হাতে সাত হাজার টাকার একটি চেক দিলেন এবং বললেন, এক মাসের জন্য কুমিল্লা একাডেমীতে যাও। সেখানে যে লাইব্রেরিটি আছে তাতে সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক অনেক বইপুস্তক আছে। মাসখানেক পড়াশোনা করে প্রাথমিক ধারণাটি গঠন কর।

১৯৭৫ সালের জুন মাসের শুরুর দিকে সমাজ উন্নয়নের বিষয়ে পড়াশোনার জন্য আমি "কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী"তে আসি। ওই একাডেমীতে থাকার সময়ে আমার চোখের সামনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখেছি, পরবর্তীকালে কার্যকারণ মিলিয়ে যখন বিচার করেছি, আমার মনে এই ধারণাটি দৃঢ়মূল হয়েছে যে, শেখ মুজিবকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল তাতে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ না করলে আমার কাহিনীটি বলা সম্ভব হবে না। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে নিজের সম্পর্কে

কিছু কথাবার্তা বলতে হচ্ছে। সপ্তাহতিনেক সমাজ উন্নয়নবিষয়ক বইপত্র নাড়াচাড়াকরে দেখলাম। শেষ পর্যন্ত নিজের সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পৌছলাম, আমাকে দিয়ে গবেষণা- টবেষণা ওসব কাজ হবে না। আমার মনের ধাঁচটা ভিন্ন রকমের। অন্যের লেখা গবেষনামূলক পুস্তক পড়তে মন্দ লাগে না। কিন্তু নিজে গবেষণা করে কিছু লেখার প্রশ্ন উঠলেই একটা অনীহাবোধ আমাকে চেপে বসে। গবেষণা তো করব না ঠিক করেছি, কিন্তু কী করব। কিছু একটা করতে তো হবে। বলে রাখা ভাল আজিজুল হক যে সাত হাজার টাকা আমাকে দিয়েছিলেন, তার প্রায় অর্ধেক ঢাকায় বসেই আমি খরচ করে ফেলেছি। বাকি সাড়ে তিনহাজারঅ একরকম খরচ হওয়ার পথে। হোস্টেলের ভাড়া দিতে হয়, দুবেলা খাওয়া, সিগারেট, চা এবং প্রতিদিন কুমিল্লা শহরে সুধা সেনের বাড়িতে কীর্তন শুনতে যাওয়া। তাড়াতাড়িই টাকাটা ফুরিয়ে আসছিল। হক সাহেবের কাছে কি কৈফিয়ত দেব, তার চাইতে আমার চিন্তা ছিল, সামনের দিনগুলোতে আমি কি করে ভাত খাব। ইউনিসেফের প্রকল্পের কাজ করব না, ঠিক করেছি। কিন্তু কী করব।

তারিখটা বলতে পারব না। দিন তারিখ মাস এসব ব্যাপারে আমার খুব তালগোল পাকিয়ে যায়। আর সব সময় ডায়েরি রাখার অভ্যাসও আমার নেই। এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে এক শুক্রবার একজন লুঙ্গিপরা ফর্সাপানা একজন ভদ্রলোক লাইব্রেরির কাছে সিড়ির গোড়ায় আমাকে ডেকে চাটগেয়ে ভাষায় বেশ নরম জবানে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আহমদ ছফা নন ? একটুখানি অবাক হয়ে গেলাম, কারণ এর আগে ভদ্রলোককে কখনো দেখিনি। লুঙ্গি, হাফহাতা হাওয়াই শার্ট এবং মাথার ওপর কিস্তি টুপি, কাপড়ে- চোপড়ে একেবারে সাধারণ। কিন্তু মুখের বচন তার অঙ্গের ভূষণের বিরোধীতা করছে। আমি স্বীকার করলাম, আহমদ ছফা আমার নাম বটে এবং জানতে চাইলাম তিনি কি করে আমাকে চিনলেন ?

তিনি বললেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি মিলনায়তনে তিনি একটি আলোচনা সভায় আমাকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এককালীন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য প্রফেসর আনিসুর রহমানের বক্তব্যের বিরোধীতা করতে শুনেছেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জানালেন, তাঁর নাম মাহবুবুল আলম চাষী এবং তিনি কুমিল্লা উন্নয়ন একাডেমীর ভাইস প্রেসিডেন্ট। এতদিন ধরে একাডেমীর হোস্টেলে থাকছি, অথচ তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করিনি, সেজন্য মৃদু অভিযোগ করলেন। আগেও একাধিকবা আমি মাহবুবুল আলম চাষীর নাম শুনেছি। শুনেছি তিনি গ্রামের মানুষের সেবা করার জন্য ফরেন সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। কলকাতায় থাকার সময়েও এক আধবার তাঁর নাম শুনে থাকব। তিনি যে এই একাডেমীতে আছেন এবং সর্বক্ষণ লুঙ্গি পরে থাকেন আমি তা জানতাম না।

চাষী সাহেব আমাকে আদর করে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন, চা খাওয়ালেন, আমি সিগারেট খাই জেনে ছেড়ে

দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চাষী সাহেব আমাকে এমন একটা প্রস্তাব দিলেন, আমি তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আপনাদের মত জ্ঞানীগুণী মানুষেরা বুদ্ধি- পরামর্শ না দিলে বঙ্গবন্ধু যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান, তা কেমন করে সম্ভব হবে ? চাষী সাহেবের কথাটি শুনে আমার তো হাসি এসে গিয়েছিল। শেখ সাহেবের লোকেরা আমাকে সমাজতন্ত্রের শত্রু মনে করে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়া চ্ছে, কোথাও স্থির হয়ে দাড়াতে দিচ্ছে না, আর চাষী সাহেব কিনা বলছেন বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমরা যদি অংশগ্রহণ না করি, তা হলে তিনি সমাজতন্ত্র করবেন কাদের দিয়ে ? আমার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে বেশি কিছু না জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে আমি সাহায্য করতে পারি। চাষী সাহেব তাঁর প্রস্তাবটি পেশ করলেনঃ

কুমিল্লা একাডেমীতে একাডেমীর স্টাফদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ চলছে। দুজন বিদেশি বিশেষজ্ঞও সেখানে অংশগ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, আমি ওই ওয়ার্কশপে বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের সহায়তা করতে পারি। আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছি, সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক দিকে একটু আধটু যে পড়াশোনা করিনি সে কথাও সত্য নয়। তথাপি আমার চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাহিত্য। বিদেশি এক্সপার্টরা যেখানে অংশগ্রহণ করছেন, এরকম একটি ব্যাপারে আমার কি করার আছে সে ব্যাপারে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সংশয় ছিল। কথা দীর্ঘ করব না। অবশেষে চাষী সাহেবের কথায় রাজি হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমাকে শুধু সমাজতন্ত্রের ইতিহাস এবং তত্বগত বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। সপ্তাহে একটি বক্তৃতা আমাকে করতে হবে এবং প্রতি বক্তৃতার সম্মানী স্বরুপ একাডেমী আমাকে এক হাজার টাকা করে দেবেন।

এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করার সময়েই আমি জনাব মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। তিনি আমাকে পছন্দ করতেন এবং অবসর সময়ে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন। এমনও ঘটেছে, কোন কোন রাতে না ঘুমিয়ে শুধু কথা বলেই পার করে দিয়েছি।

আমার সঙ্গে মাহবুবুল আলম চাষী সাহেবের নানাবিষয়ে বিস্তর গড়মিল ছিল। আমি সিগারেট খেতাম। তিনি ধুমপান একেবারেই পছন্দ করতেন না। অল্পতেই আমি ক্ষেপে উঠতাম, তিনি সবসময়ে একটা সংযম রক্ষা করতেন। আনুষ্ঠানিক ভোজসভা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিরামিষ আহার করতেন। কৃষক সমাজের কিসে প্রকৃত উন্নতি হয় সে বিষয়ে চিন্তা- ভাবনাও করতেন। রাশিয়ান লেখক ঋষি টলস্টয় তাঁর অত্যন্ত প্রিয় লেখক ছিলেন। নিতান্ত নিরাড়ম্বর এবং সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। আমি এ ধারণায় উপনীত হয়েছিলাম যে, টলস্টয় পন্থা এবং গান্ধীবাদের মত এক ধরনের আদর্শবাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ঠ ভক্তি- শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার একটা অকৃত্রিম বলবান আকাঙ্খাও তাঁর মধ্যে দেখেছি।

চাষী সাহেবের চরিত্রের আরেকটা দিকের প্রতিও আমার দৃষ্টি পড়েছে। তিনি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন ছিলেন। সুপিরিয়র সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামের দরিদ্র জনগণের সেবা করতে এসেছেন, এ কথা তিনি ভুলতে পারতেন না। নানা অছিলায়, অন্যকেও সে কথা মনে করিয়ে দিতে ত্রুটি করতেন না। নিজের শক্তির ওপর তিনি অতিমাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন। সামনাসামনি অন্যদের সাথে কোন তর্কে প্রবৃত্ত হতেন না। তবে এ কথা ঠিক যে, অন্যকোন ব্যক্তির মতামতকে তিনি ততটা দাম দিতেন, যতটা তাঁর কাজে লাগে। উদ্দেশ্য গোপন রেখে নীরবে কাজ করে যাওয়ার ধৈর্য্য এবং অভিজ্ঞতা দুই- ই তাঁর ছিল। ক্ষমতার প্রতি একটা একাগ্র আকাঙ্খা তাঁর মধ্যে কাজ করতে দেখেছি।

একাডেমীর হোস্টেলের পেছনে একটা কক্ষে তিনি থাকতেন। একটা তক্তপোশ, একটা সাধারণ টেবিল, দুটো চেয়ারের বেশি আসবাবপত্র তাতে ছিল না। তিনি আটার রুটি এবং সবজি দিয়ে নাস্তা করতেন। দুপুরে ঐ একই ধরনের খাবার তিনি খেতেন। আমাকে যখন তখন ডেকে পাঠাতেন। কি কারণে বলতে পারব না, মানসিকভাবে তিনি আমার ওপর নির্ভর করতে চাইতেন। পরবর্তীতে অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা আমি খুজে পেয়েছি। সেকথা পরে বলব।

প্রায় সময় তিনি তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে ট্রাংকল করে কথা বলতেন। যতদিনই সকালে বা বিকালে আমি চাষী সাহেবের ঘরে গিয়েছি দেখেছি তিনি তাহেরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন অথবা অপারেটরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, চেষ্টা করতে ঢাকায় ঠাকুর সাহেবকে পাওয়া যায় কিনা। স্বভাবতই আমার ধারনা হয়েছিল চাষী সাহেবের সাথে ঠাকুর সাহেবের খুব গভীর সম্পর্ক রয়েছে। একবার তো আমি তাঁকে জিজ্ঞেসস করেছিলাম, আলম সাহেব আপনার সঙ্গে ঠাকুর সাহেবের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ তাই না। তিনি কি আপনার ছেলেবেলার বন্ধু ? আমার কথা শুনে তিনি খুব উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিলেন। জবাবে বলেছিলেন, তাহেরউদ্দিন ঠিক আমার ছেলেবেলার বন্ধু নয়। তবে জানেন কি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি, তাহেরউদ্দিন এবং মোশতাক সাহেব একসঙ্গে ছিলাম।

তিনি টেবিল থেকে আনুমানিক ৬ ইঞ্চি * ৮ ইঞ্চি সাইজের বাঁধানো একটি ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, এই যে দেখুন আমার, মোশতাক সাহেব এবং তাহেরউদ্দিনের ছবি। কলকাতাতে আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম এবং কাজ করতাম।

মাঝখানে আমি কিছুদিনের জন্য ঢাকা এসেছিলাম। সপ্তাহখানেক পর একাডেমীতে ফিরি। সেই সন্ধ্যাবেলা ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে দেখি চেয়ার টেবিল একটাও নেই।সব ক্যান্টনমেন্টে ধার দেইয়া হয়েছে। কোন এক কর্ণেলের বিয়ে হচ্ছে। ঐ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মোশতাক সাহেবও এসেছেন। ঐ ঘটনাটিকেও নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা হিসেবেই আমি গ্রহণ করেছিলাম।

আমি ঠিক প্রফেশনাল সমাজবিজ্ঞানী ছিলাম না। ওয়ার্কশপে বক্তৃতা দেয়ার সময় প্রায় সময়ে একাডেমীর কোন কোন স্টাফ আমার বিরোধীতা করতেন। এটা খুব সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল। আমার মত একজন, বলতে গেলে রাস্তার মানুষের বক্তব্য মেনে নিতে তাঁদের পেশাগত অহঙ্কারে বাধত। আমাকে বক্তৃতা করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, অনেকেই এটা পছন্দ করতেন না। চাষী সাহেব সবসময়ে আমাকে সমর্থন করতেন এবং আমার পক্ষ হয়ে কথা বলতেন। একাডেমিতে আমাকে পছন্দ করার মত যথেষ্ট বন্ধু- বান্ধবও ছিলেন। তারপরেও আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম, কিছু ভদ্রলোক মনে করছিলেন, আমি নেহায়েত অনধিকার চর্চা করছি। তাঁদের কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। এই অস্বস্তিকর অযাচিতভাবে পাওয়া কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার প্রাণ হাঁসফাঁস করছিল। একদিন মাহবুবুল আলম চাষীর কাছে আমার চলে আসার বিষয়টা উত্থাপন করি। কথা শুনে তিনি একটুখানি বিষণ্ণ হয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি চলে এলে তিনি খুব একা অনুভব করবেন। একথা সেকথার ফাঁকে এটাও তিনি জানালেন যে, কুমিল্লা একাডেমীতে সারাজীবন কাটাবার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি বলতেন, একাডেমী আমার " Temporary hideout " (অর্থাৎ অস্থায়ী পালিয়ে থাকার জায়গা)। সেই সময়ে **"টেম্পোরারী হাইডআউট"** বলতে তিনি কি বোঝাতেন, তার তাৎপর্য আমি অনুধাবন করতে পারিনি। পরবর্তীকালে তিনি যখন খন্দকার মোশতাকের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী হিসেবে "গণভবনে" আসেন সমস্ত ব্যাপারটা তখনই আমি বুঝতে পারি। সে সম্পর্কে পরে বলব।

আরেকটা ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। দিনতারিখ মনে করতে পারব না। বোধ করি জুলাই মাসের শেষের দিকে হবে। প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ইকনমিক সেক্রেটারি ডঃ সাত্তার একাডেমীতে এসে হাজির। তিনি ছিলেন ক্ষমতার নিকটতম ব্যক্তি। তাঁর আগমন উপলক্ষে একাডেমীতে একটা চাপা উত্তেজনা। চাষী সাহেব একাডেমীর অফিসে সাত্তার সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম, আমাকে তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি অঢেল ক্ষমতার অধিকারী, মুজিব সরকারের আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি যা বলছেন, দেখলাম সকলে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। আমি কোথাকার নাম পরিচয়হীন একজন অখ্যাত লেখক। কথায় কথায় প্রতিবাদ করছিলাম, এ জিনিসটা তাঁর উপাদেয় হওয়ার কথা নয়।

ডঃ সাত্তারের কাছ থেকে জানতে পারলাম, একটি কি দুটি গ্রামে সমাজতন্ত্রের মডেল তৈরি শেখ সাহেব তাঁকে একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছেন। এরকম একটি মডেল দাঁড় করানোর জন্য সাত্তার সাহেব চাঁদপুরে তাঁর আপন গ্রামে "মেহেরপুর- পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতি" নামাঙ্কিত একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই প্রস্তাবিত সমাজতন্ত্রের মডেলটি কি ধরনের হবে তা পর্যালোচনা করার জন্য ডঃ সাত্তার ওই গ্রামেই একটি সিম্পোজিয়াম কিংবা ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছেন। একাডেমীর সমস্ত পদস্থ কর্মকর্তা, কুমিল্লার ডিসি, এডিসি, এসডিও এবং স্থানীয় আওয়ামীলীগের গুরুত্বসম্পন্ন নেতা এবং কর্মীদের নিমন্ত্রণ করে তিনি মেহেরপুর- পঞ্চগ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে নিমন্ত্রণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। দেশের প্রেসিডেন্ট যার ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছে, তাঁকে খুশি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে আপনা থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। সৌজন্যের খাতিরে সাত্তার সাহেব আমাকেও যেতে বলেছিলেন। তাঁর মুখের ওপর বলে দেই যে, আমি যাব না। তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন কেন আমি যেতে চাই না, বললাম, ক্ষমতার কাছে মানুষ সকলে আপনার কথা মেনে নেয় এটা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আপনাকে খুশি না করলে আপনি কোনভাবে আমাকে বাধ্য করতে পারবেন না।

ঐ মেহেরপুর- পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতির ওয়ার্কশপে বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের লোকেরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারা কারা ছিলেন, সঠিক মনে পড়ছে না। ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্বয়ং অথবা হাই কমিশনারের দায়িত্বশীল কোন কর্মচারী, অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার এবং কানাডিয়ান দূতাবাসের লোকজনও অংশ নিতে চাঁদপুর গিয়েছে। মার্কিন দূতাবাসের কেউ ছিল কিনা এখন মনে করতে পারছিনে। আমার অনুমান ঐ ওয়ার্কশপের সঙ্গে শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। কেন আমার মনে এই ধারণা জন্মে গিয়েছিল সেকথা আমি পরে বলছি।

মেহেরপুর- পঞ্চগ্রাম থেকে ফেরার পথে ডঃ সাত্তার আবার একাডেমীতে এসেছিলেন। তিনি কথায় কথায় জানিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট তাঁকে খুব স্নেহ এবং বিশ্বাস করেন। আর তিনিও প্রেসিডেন্টকে খুব শ্রদ্ধা করেন। শেখ সাহেব কাঁঠাল এবং ছোট মাছ খেতে পছন্দ করেন। তাই তিনি তাঁর জন্য খাজা কাঁঠাল এবং ছোট মাছ ভাজা করে নিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর- পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতির কর্মীদের আমি কুমিল্লা একাডেমীতে ট্রেনিং নিতে দেখেছি। তারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন।ট্রেনিং গ্রহণকারী কর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন ডঃ সাত্তারের পিতা। সাদা লুঙ্গি, পাঞ্জাবি এবং মাথায় টুপিপরা প্রবীণ ভদ্রলোকের ছবিটি আজও আমার চোখে ভাসছে। সেই সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে বড় বড় ঘটনা ঘটছিল। শেখ সাহেব "কৃষক- শ্রমিক আওয়ামী লীগ" সংক্ষেপে 'বাকশাল' গঠন করেছেন। বাকশালের উল্লেখযোগ্য

সদস্যদের নামও সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হচ্ছিল। নির্বাচিৎ এমপি এবং সরকারি আমলাদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে জেলা গভর্ণরদের নামও ঘোষণা করা হয়ে গেছে। নতুন শাসন ব্যবস্থা নিয়ে সকলে কথাবার্তা বলছিল। একাডেমীতে ব্যস্ততা লক্ষ করা যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল, একাডেমীতে জেলা গভর্ণরদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১৯৭৫ সালের দশই আগস্ট তারিখে সকালবেলা রেডিওতে শুনলাম পূর্বের দিন কবি সিকান্দার আবু জাফর মারা গেছেন। জাফর সাহেবের সঙ্গে আমার সুন্দর সম্পর্ক ছিল। তাঁর মৃত মুখ শেষবারের মত দেখার জন্য আমি একরকম ভেজা কাপড়েই ঢাকা চলে আসি। ঢাকা তো চলে এলাম, কিন্তু জাফর ভাইকে দেখতে পেলাম না। আগেই তাঁর দাফন হয়ে গেছে।

ঢাকায় এসে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি লক্ষ করি। নানান পেশার লোক দলে দলে মিছিল করে শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বাকশাল কর্মসূচির প্রতি আনুগত্য নিবেদন করছেন। শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিক, শ্রমিক এবং আরো নানা পেশার মানুষ মিছিল করে শেখ সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য ছুটছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সকাল থেকে সন্ধে। জনস্রোতের বিরাম নেই, সকলেই বঙ্গভবন অভিমুখে ছুটছে। কে কার আগে যাবে প্রতিযোগিতা চলছে।

গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ভয়ানক বিদঘুটে মনে হয়। একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। প্রেসক্লাবে গিয়ে খুব সম্ভবত সাংবাদিক নির্মল সেনের সাথে একদলীয় শাসনের প্রতি কান্ডজ্ঞানহীন আনুগত্য ঘোষণার কুফল সম্পর্কে কথাবার্তা বলি। আমার সঙ্গে কারও কোন সম্পর্ক ছিল না। বাকশালী নীতির বিরোধীতা করতে হবে এরকম কোন পূর্বপরিকল্পনাও ছিল না। আপনাআপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসছিল। শুধু প্রেসক্লাব নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্জাক সাহেবের বাসায় গিয়ে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলি। এখন নাম মনে পড়ছে না, অনেকের সঙ্গেই কথাবার্তা বলেছি।

পনেরই আগস্ট প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার তোড়জোড় চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে চুনকাম করা হচ্ছে, রাস্তায় পিচ ঢালা হচ্ছে। সর্বত্র একটা আসন্ন উৎসবের আমেজ। খবর শোনা যাচ্ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত শিক্ষক বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য সই করে ফেলেছেন। প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে সকলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করবেন। আরো শুনতে পাচ্ছিলাম, কোন কোন সাংবাদিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আট দশজন শিক্ষক বাকশালে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন।

আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলাম না। আমি শুধু লিখতাম এবং কথা বলতাম, সব সময় অসংকোচে কথা বলতাম। আমি রাতে থাকব কোথায়, পরের বেলা খাবার জোটাব কি করে তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তবু বিপদে পড়ে গেলাম। কি করে প্রচারিত হয়ে গেছে যে আমি শিক্ষক সাংবাদিকদের যোগ না দেওয়ার জন্য প্রচার কার্য চালাচ্ছি। এই খবরটা শেখ সাহেবের বড় ছেলে শেখ কামালের কানে যথারীতি পৌছায়। শুনতে পেলাম তিনি আমাকে উচিত শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আমার অবস্থা দাঁড়াল ফাঁদে ধরা পশুর মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বন্ধু-বান্ধবের বাসায় গিয়ে একটা নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। একজন তো বলেই দিলেন, ভাই আমরা বউ ছেলে নিয়ে বসবাস করি। তোমাকে বাসায় বসতে দিতে পারব না। তোমার নামে নানা গুজব। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে জানলে বিপদে পড়তে পারি।

আমি চৌদ্দই আগস্ট সন্ধ্যাবেলার কথা বলছি। একজন ভগ্নিস্থানীয়া হাউজ টিউটরের বাসায় গিয়ে হাজির হই। আমার বিশ্বাস ছিল, তাঁর কিছু উপকার করেছি। আমি খাইনি এবং কিনে খাওয়ার পয়সা নেই। লাজশরমের মাথা খেয়ে তাঁকে কিছু খাবার দিতে বলি। মহিলা পলিথিনের ব্যাগে কিছু মোয়া দিয়ে বললেন, ছফা ভাই এগুলো পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি খেয়ে নেবেন। আপনাকে বসতে দিতে পারব না।

তাঁর বাসার বাইরে এসে কি ধরনের বিপদে পড়েছি পরিস্থিতিটা আঁচ করতে চেষ্টা করলাম। বলতে ভুলে গেছি কার্জন হলে না কোথায় দুটো বোমা ফুটেছে। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সেই সময়ে আমার বন্ধু অরুণ মৈত্র আমার সঙ্গে ছিলেন। অরুণ 'ইস্টল্যান্ড' নামে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থাতে কাজ করতেন। অরুণের সঙ্গে আমি হেঁটে হেঁটে বলাকা বিল্ডিং এর কাছাকাছি আসি। অরুণ আমাকে বললেন, সময়টা আপনার জন্য অনুকুল নয়। আপনি কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যান। পরামর্শটা দিয়ে অরুণ বাসায় চলে গেলেন।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আমি বলাকা বিল্ডিং এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ওমা, কিছু দূর যেতেই দেখি একখানা খোলা জিপে সাঙ্গপাঙ্গসহ শেখ কামাল। একজন দীর্ঘদেহী যুবক কামালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, দেখ কামাল ভাই, আহমদ ছফা যাচ্ছে। কামাল নির্দেশ দিলেন, হারামজাদাকে ধরে নিয়ে আয়। আমি প্রাণভয়ে দৌড়ে নিউমার্কেটের কাঁচাবাজারের ভেতর ঢুকে পড়ি। যদি কোনদিন স্মৃতিকথা লিখতে হয়, এই পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিশদ করে বর্ণণা করব। বর্তমান মূহূর্তে নিজের বিষয়ে অধিক কিছু বলব না। তা হলে যে বিষয়টা আমি বিবৃত করছি, তাঁর ওপর

সুবিচার করা সম্ভব হবে না। ওই চৌদ্দই আগস্ট রাতে আমি সোবহানবাগের বিপরীতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সেন্টারের হোস্টেলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। ঐ হোস্টেলে থাকতেন আমার এক বন্ধু। জাসদ দলটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর নাম ছিল সিরাজদ্দৌলা চৌধুরী। লম্বা চওড়া সুঠাম চেহারার যুবক। তাঁর একটা পা ট্রেন দুর্ঘটনায় কাটা পড়েছিল। তাই তাঁকে নকল পা ব্যবহার করতে হত। তিনি ছিলেন 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার' এর ইন্সট্রাক্টর। রোটারি ক্লাব থেকে একটা বৃত্তি পেয়েছেন সম্প্রতি এবং আমেরিকায় যাওয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন।

সোবহানবাগস্থ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার থেকে শেখ সাহেবের বত্রিশ নম্বরের বাড়ির দূরত্ব কয়েকশ গজের বেশি হবে না। সে রাত্রের শেষভাগে আচমকা প্রচন্ড গুলিগোলার শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। একটানা গুলিগোলা চলছিল। আমরা ধারণা করছিলাম, শেখ সাহেব যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে না পারেন, সেজন্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল একটি সুইসাইড স্কোয়াড পাঠিয়েছে। তারাই মধ্যরাতে গুলিগোলা, হ্যান্ডগ্রেনেড ইত্যাদি ছুঁড়ছে। প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি অন্যান্যদের সঙ্গে কর্ণেল শাফায়াত জামিলের মৃত্যুদৃশ্যটাও দেখেছি। বর্তমান লেখায় তাঁর উল্লেখ করব না। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন সম্ভব হয় তবে। সকালবেলা রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর শুনে জানতে পারলাম, শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ শাসনভার গ্রহ্ণ করেছেন। পরবর্তীতে কি ঘটে জানার জন্য রেডিওর কাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু বেলা হলেই রেডিও জানাল, তিন বাহিনী প্রধান এবং বিডিআর, পুলিশের সর্ব্বোচ্চ কর্তারা মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

পনেরই আগস্ট দিনটি ছিল শুক্রবার। কারফিউ ছিল কিনা মনে করতে পারছিনে। পথে বের হওয়া নিরাপদ মনে হলে দুপুরবেলা আমি হেঁটে হেঁটে মুহম্মদপুরের হুমায়ুন রোডে ডঃ আখলাকুর রহমানের বাড়িতে হাজির হই। ডঃ আখলাক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সে সূত্রে আমার সঙ্গেও তাঁর কিছু পরিমাণ ঘনিষ্টতা হয়েছিল। দেশে কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা জানার জন্যই আমি ডঃ আখলাকুর রহমানের বাড়িতে হাজির হই। তাঁর বাড়িত গেটে গিয়ে দেখি প্রায় বিশ- বাইশজন সামরিক বাহিনীর লোক গার্ড দিচ্ছে। আমাকে গেট ঠেলে বাড়িতে ঢুকতে দেখে চার- পাঁচটা স্টেনগান আমার দিকে বাগিয়ে ধরে জোয়ানেরা থামতে বলল। আমার তো হাসি পেয়ে গেল। আমাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য রিভলবারের একটা গুলিই তো যথেষ্ট। এত উদ্যমের অপচয় কেন ? সে সময়ে ডঃ আখলাকুর রহমান বেরিয়ে এসে আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। ওখানেও দেখি সামরিক বাহিনীর লোকে ভর্তি। ওই পনেরই আগস্ট তারিখেই ডঃ আখলাকের বাড়িতে ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটেন একজন প্রত্যয়দীপ্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আখলাক সাহেব আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম কর্ণেল আবু তাহের। সেই কর্ণেল তাহেরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তারপরে আর কোনদিনই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। দু- একদিন পরে ডঃ

আখলাককে মিসেস আখলাকের সঙ্গে বলাবলি করতে শুনেছি, সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাঁকে দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। আখলাক সাহেব রাজী হননি। আমার মনে কিন্তু একতা ভিন্ন ধরনের চিন্তার উদয় হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর লোকেরা শেখ মুজিবের বিরোধী শিবিরের লোকজনের কাছে টোপ ঝুলিয়ে রেখে নিজের অবস্থান সজ্বত করে নিচ্ছিল। শেখ মুজিবকে হত্যা করে অন্য কাউকে প্রেসিডেন্ট বানানোর ইচ্ছা তাদের থাকার কথা নয়। যাহোক এটা আমার অনুমান মাত্র।

ষোল তারিখ বেলা ১০টার দিকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে যাই। কুমিল্লা একাডেমীতে যাওয়ার পূর্বে আমি এই ছাত্রাবাসের ২০৬ নম্বর কক্ষে থাকতাম। গেটের কাছে আমার সঙ্গে ইতিহাসের শিক্ষক আহমেদ কামালের সঙ্গে দেখা। তিনি তখন আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে থাকতেন কিনা মনে করতে পারছিনে। কামাল জানালেন, তাঁরা মনে করেছিলেন পূর্বরাতে আমাকে খুন করা হয়েছে। আরো জানালেন, প্রফেসর রাজ্জাক হাসপাতাল এবং মর্গে খোঁজখবর করেছেন। রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে তারপর দেখা করতে যাই। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা খেয়াল নেই। দুপুরবেলার খাবারটা আজিজুল হক সাহেবের সঙ্গে খাই। আগেই বলেছি, তিনি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষিকা হুসনে আরা হকের স্বামী। থাকতেন "উদয়ন স্কুল" এর দক্ষিণে বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার্সে। সেই বাড়িতে তখন সস্ত্রীক গ্যাসকার্টও ছিলেন। মিসেস হক এবং জনাব আজিজুল হক আমাকে বেপরোয়াভাবে রাস্তাঘাটে চলাচল করতে বারণ করেন এবং গ্যাসকার্টকে অনুরোধ করেন আমাকে যেন তাঁর গাড়িতে করে যেখানে যেতে চাই নামিয়ে দেন। গ্যাসকার্টের মাইক্রোবাসে উঠে বসলে তিনি জানতে চান, আমি কোথায় যাব। আমি মোহাম্মদপুরে পৌছে দিতে অনুরোধ করলাম। গ্যাসকার্টের বৌ ছিলেন জাতে আইরিশ। তিনি গাড়িতে তর্ক জুড়ে দিলেন। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছ একথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না। আমি বললাম, 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।' ভদ্রমহিলা একরকম চিৎকার করেই বলতে আরম্ভ করলেন, "লুক আই ডু নট বিলিভ দ্যাট হি ইজ কিলড।" বুঝতে পারলাম এ বিষয়ে মহিলার সঙ্গে অধিক কথা বলা নিরর্থক।

গ্যাসকার্ট মিরপুর রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বত্রিশ নম্বরের সামনে তিতাস কনফেকশনারি দোকানটি খোলা দেখে তিনি বললেন, বিকাল থেকেই তো কারফিউ শুরু হবে। আমি এই দোকান থেকে পাউরুটি এবং অন্যান্য কিছু জিনিস কিনে নেই। গাড়ি থামিয়েই তিনি দোকানের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তখনো মহিলা আউড়ে যাচ্ছিলেন, "আই ডু নট বিলিভ দ্যাট শেখ গট কিলড।" আমি জানালার কাচের ভেতর দিয়ে দেখি শেখ মুজিবের বত্রিশ নম্বর বাড়ির দিক থেকে এসে একটি মিলিটারি ট্রাক থামল। ট্রাক বোঝাই জিনিস ঢাকা দেওয়ার জন্যে হলুদ রঙের ত্রিপল চাপানো হয়েছে। হঠাৎ করে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল এই ট্রাকে করে শেখ মুজিবের লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখি পায়ের বুড়ো আঙুল দেখা যাচ্ছে। অত দীর্ঘ বুড়ো আঙুল শেখ মুজিব ছাড়া আর কারো হতে পারে

না। আমি মিসেস গ্যাসকার্টকে ডেকে বললাম, “ইউ ডু নট বিলিভ শেখ গট কিলড, লুক হিজ টো ভিজিবল আন্ডার দ্যা ত্রিপল অন দিজ ট্রাক।” ভদ্রমহিলা ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আর কোন কথা বললেন না। তাঁর চোখ দিয়ে বড় বড় পানির ফোঁটা নামতে লাগল। সেদিন সন্দধের টিভিতে এলেন ডঃ সাত্তার। আমাদের ছেলেরা এই মহান দায়িত্ব পালন করে নিরাপদে ফিরে আসতে পারার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন। ডঃ সাত্তারকে টেলিভিশনে এই কথা বলতে শুনে আমি তো বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম। আমি নিজের কানে শুনেছি, তিনি বলেছেন, শেখ মুজিব তাঁকে পুত্রের মত স্নেহ করেন, আর তিনিও তাঁকে পিতার মত ভক্তি করেন।

শেখ সাহেবের মৃত্যুর পর আমি আর কুমিল্লা ফেরত যাইনি। সবাই আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি যেন ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে আমার স্কলারশিপটা ফেরত দিতে বলি। আমি একটু ইততস্ত করছিলাম। কারণ স্কলারশিপটা আমি স্বেচ্ছায় রাগ করে ছেড়ে দিয়েছি। আবার ফেরত চাইতে গেলে কেমন দেখায়। কেউ কেউ আমাকে বললেন, তুমি মতিন চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা কর। তিনি অবশ্যই ফেরত দেবেন। আমি মতিন চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মতিন চৌধুরীর পূর্বের তেজ- বীর্য কিছুই নেই। একেবারে চুপসে গেছেন। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। এককথায় তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্রোকেন মানুষ। আমার স্কলারশিপটা ফেরত দিতে নীতিগতভাবে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ব্যাপারে আর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। আমি নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। তখন বন্ধু- বান্ধবদের কেউ কেউ আমাকে বললেন, মতিন চৌধুরীর সাধ্য নেই তোমাকে স্কলারশিপ ফেরত না দেওয়ার। তুমি মাহবুবুল আলম চাষীর সাথে দেখা কর। তিনি বললে মতিন চৌধুরী অবশ্যই স্কলারশিপ ফেরত দেবেন। এখানে বলে রাখা ভাল, মোশতাক প্রেসিডেন্ট হওয়ার অব্যবহিত পরেই চাষী সাহেব তাঁর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী হিসেবে বঙ্গভবনে ফিরে এসেছেন।

অগত্যা আমি মাহবুবুল আলম চাষী সাহেবকে টেলিফোন করলাম। তাঁর পিএ টেলিফোন ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গেই চাষী সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনলাম, এতদিন বাদে আপনি যোগাযোগ করছেন। আশা করেছিলাম আগেই টেলিফোন করবেন।

আমি বঙ্গভবনে গেলাম। হাজার ব্যস্ততা সত্বেও চাষী সাহেব আমার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেখা করলেন। ৬ইঞ্চি * ৮ ইঞ্চি সাইজের বাঁধানো ফটোগ্রাফটি আমাকে আবার দেখিয়ে বললেন, আপনার মনে আছে, একাডেমীতে বলেছিলাম, আমি, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এবং মোশতাক সাহেব একসঙ্গে কলকাতায় ছিলাম। বলেছিলাম না, একাডেমী আমার **‘টেম্পোরারী হাইড আউট’**। দেখতেই তো পাচ্ছেন আমরা আবার তিনজন বঙ্গভবনে একসঙ্গে কাজ করছি। চাষী সাহেব টেলিফোন করে অবিলম্বে মতিন চৌধুরী সাহেবকে আমার স্কলারশিপ ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং

মতিন চৌধুরী সে কথা রক্ষ করেছিলেন।

মাহবুবুল আলম চাষীকে আমি সর্বাংশে না হলেও অনেকখানি পছন্দ করতাম। তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করার মত অনেক গুণ ছিল। তিনি জীবনে মার অনেক উপকার করেছেন। তাঁর ঋণ আমার পক্ষে কোনদিন শোধ করা সম্ভব হবে না। এ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে যেসব কথা বলেছি সব সত্য বলেছি। একটি কথাও বানিয়ে বলিনি। এই বিষয়টা নিয়ে আমি দীর্ঘদিন চিন্তা করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে আমি সুখে ছিলাম না। বর্তমানেও আমি আওয়ামী লীগ সমর্থক নই। তবু শেখ হত্যার ব্যাপারটি আমাদের জাতীয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে আমার দেয়া তথ্যসমূহ বিশেষ কাজে আসবে মনে করে এ রচনাটি লিখলাম।

****

- রাজনীতির লেখা (১৯৯৩)